রাজনৈকি নেতা হিসাবে নবী(স.) ও আজকের প্রাসঙ্গিকতা

ড. মুহাম্মদ আফসার আলী

প্রাবন্ধীক

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন। আর রাজনীতি যেহেতু জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই, ইসলামি জীবন-দর্শনে রাজনীতি অপরিহার্য। নবী মুহাম্মদ (স.) সেই ইসলামের মহান শিক্ষক ও শেষ পথ-প্রদর্শক, অর্থাৎ নেতা। তাই, তাঁর জীবনে ও শিক্ষায় রাজনীতি একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রেখেছে।

আজকে যেমন নেতা হওয়ার জন্য লোকেরা মরিয়া – নানা রকম কলা-কৌশল, মিথ্যাচার, দূর্নীতি, খুন-খারাবির সীমা ছাড়িয়ে যায়; নবী(স.)-এর নেতৃত্ব কিন্তু ছিল একটি উজ্জ্বল আদর্শের নিদর্শন। তাঁকে নবী (নেতা) নির্বাচন করা হলেও তিনি তা বুঝতেও পারেন নি! হজরত খাদিজা (রা.)-এর চাচা, ওকারা-বিন-নাওফল তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে নবী(স.)-কে যখন বলেন যে আল্লাহ তআলা তাঁকে নবী (নেতা) নির্বাচন করেছেন এবং হীরা গুহায় তাঁকে পাঠদানকারি অন্য কেউ ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং অহি-বাহী ফেরেস্তা জিবরাইল (অ.) – তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। অর্থাৎ, তিনি নিজে নেতা হতে চান নি, তাঁকে নেতা করা হয়েছিল। এটা গেল, নেকা কে? – এই প্রশ্নের উত্তর। এবার দেখা যাক নেতার দরকার কী? বা নেতার কাজ কী? - মিথ্যা ও অবিচারকে উৎখাত করা এবং সত্য ও ন্যায়বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করা – হল সার্বজনিনভাবে আদর্শ নেতার কাজ। সত্য হলেন স্রষ্টা এবং তাঁর আদেশই হল ন্যায় বিচার। সত্য স্রষ্টা আল্লাহর ন্যায়বিচারের আদেশ হল – নিরপরাধকে হত্যা করো না, দুর্বলদের উপরে অত্যাচার করো না, কাউকে ঠকিও না. মহিলাদের সম্মান করো, বেশ্যাবৃত্তি ও ব্যাভিচার করো না, জুওয়া খেল না, ঘুস খেও না, মদ খেও না, সুদ খেও না – গরিব এবং অসহায়কে বাধ্যতামূলকভাবে দান করো, ইত্যাদি। নবী(স.) সারা জীবন এই কাজই করে গেছেন। কিন্তু আদেশ কার্যকরি হয় কেবলমাত্র ক্ষমতাশীনদের; ক্ষমতা ছাড়া আদেশের কোনো মূল্য নেই; টিকতে পারে না। আমাদের দেশেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান হয়েছিল। কিন্তু আজ ইন্ডিয়াতে তাঁরা প্রায় নিশ্চিহ্ন! কারণ, তারা রাষ্ট্র-ক্ষমতা হারিয়েছেন। যতদিন রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে ছিল (নন্দ ও মৌর্য রাজত্ব পর্যন্ত) ততদিন তাঁদের আদেশ কার্যকরি ছিল। সুতরাং, রাষ্ট্রক্ষমতার সমর্থন ছাড়া কোনো দর্শর (জীবন বিধান) বাঁচতে পারে না – সত্য সুরক্ষিত হতে পারে না। তাই, নেতা হিসাবে নবী(স.) রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন।

এখন দু'টো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে যে, তিনি কিভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং ক্ষমতাশীল নেতা হিসাবে তিনি কী কাজ করেছিলেন? প্রথম প্রশ্নটি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল এবং দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রদর্শন ও দেশনায়কের যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। নবী(স.)-এর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার কৌশল হিসাবে এক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বিষয়টি আলোচলা করতে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের ঘটনাটি সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একটি ছোলার বীজ প্রথমে মাটির ভিতরে নিজের মূলটিকে

প্রথিত করে, তার পরে যখন দেখে যে মাটির উপরে মাথা তুললে মাথার ভারটি মূলটি সহ্য করতে পারবে, কেবল তখনি সে মাথা তুলে বিশ্বকে নিজের অস্তিত্ব জাহির করে, তার আগে নয়। নবী(স.)ও সেইরূপ কৌশলই নিয়েছিলেন। আল্লার দ্বারা নেতা নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশ্বকে জানান দিয়ে দেন নি তাঁর নেতৃত্ব; দীর্ঘ তিন বছর তিনি অতি গোপনে, রাতের অন্ধকারে তাঁর সমর্থক- অনুসারী সংগ্রহ করতে লাগলেন। তার পর তিনি যখন দেখলেন যে, তাঁর নেতৃত্বের বিরোধীতায় যে ঝড় উঠবে সেটা মোকাবিলার মতো মোটামুটি সমর্থক-শক্তি সংগ্রহ হয়ে গেছে – কেবল তখনি তিনি নেতৃত্বের ঘোষণা দিলেন।

তাঁর কৌশলের মধ্যে ছিল অসীম ধৈর্য। নেতা ঘোষণার পরের ২ বছর লোকের বিদ্রূপ, উপহাস সহ্য করেছেন। পরের ৫ বছর কূটক্তি, গালাগালি, অপমান, অবরোধ, সামাজিক বহিষ্কার ইত্যাদি সহ্য করেছেন। এই সময় (৬১৫ সালে) তিনি অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, পাশের দেশ তায়েফে আশ্রয়ের জন্য যান। কিন্তু, আশ্রয়ের পরিবর্তে তিনি পেলেন লাঞ্ছনা, এমনকি শারিরীক নিগ্রহ! এইখানেই শেষ নয়, মক্কায় তাঁকে তাঁর গৌত্রসহ দীর্ঘ তিন বছর ধরে (নব্বী সাল ৭ম থেকে ১০ম) অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈকটের শিকার হয়ে পাহাড়ের এক কোনে সহায়-সম্পদহীনভাবে আবদ্ধ থাকতে হয়। পরিস্থিতি এমন সঙ্গীন হয়ে যায় যে তাঁদেরকে গাছের পাতা খেয়ে দিন যাপন করতে হয়। কিন্তু তিনি ধৈর্য হারাননি – শত্রুদের দ্বারা প্রলুব্ধ করা সম্পত্তি, প্রতিপত্তির প্ররোচনায় নিজের কঠোর পরিশ্রম ও অনিশ্চয়তার মিশন থেকে সরে চান নি।

তাঁর কৌশলের অন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, তিনি মুসলিম, অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে সঙ্গে নিয়েছেন; বিশেষ করে দুর্বল, শোষিত সমাজকে। মদিনায় গিয়ে তিনি প্রথমেই সেখানকার ইহুদী, খ্রীষ্টান, মূর্তিপূজক, মুসলিম, নাস্তিক, সকলকে নিয়ে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে 'মদিনা সনদ' নামে একটি মোর্চা সংবিধান তৈরি করেন – যেটাকে পৃথিবীর প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানও বলা হয়। যার কাছ থেকে যতটা পাওয়া যায়, তিনি তাই নিয়েছেন লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য। কেউ সহযোগিতার চুক্তি করেছেন, কেউ নিরাপত্তার, কেউবা অন্ততঃ নিরপেক্ষতার। তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কাউকেও দূরে সরিয়ে দেন নি। এমনকি তাঁর ঘোষিত শত্রু, মুনাফেক সর্দার আব্দল্লাহ–বিন-উবাইকেও সহযোগি হিসাবে সঙ্গে নিয়েছেন বৃহৎ রাজনেতিক মিশনের প্রয়োজনিয়তার কারণে। এখান থেকে আমাদের বর্তমান মোর্চা রাজনীতির অনেক কিছু শেখার আছে।

নবী (স.)-এর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিল নমনীয় ও দূরদর্শীতাপূর্ণ। তিনি হিজরী ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে মক্কায় হারাম শরিফ তাওয়াফ করতে যাওয়ার পথে মক্কার অমুসলিমদের আপত্তির সম্মুখিন হন। বিশ্বস্ত সাহাবারা সেই আপত্তি উপক্ষো করে শক্তি-প্রয়োগে এগিয়ে যেতে অনড় থাকলেও তিনি তা না করে মক্কাবাসীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি (হুদায়বিয়ার শান্তিচুক্তি) করে নেন এবং ফিরে আসতে রাজি হন। এই চুক্তির অন্য কিছু ধারাও মুসলমানদের কছে আপাতত অপমানকর ছিল; কিন্তু এর সুদূরপ্রসারি কল্যাণগুলো সাধারণের দৃষ্টিগোচর ছিল না। কিন্তু নবী(স.) প্রকৃত নেতার দূরদর্শিতায় সেগুলো দেখতে

পেয়েছিলেন। তাই, বৃহত্তর ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য আপাত অপমান সহ্য করে নিয়েছিলেন – নবী হয়েও।

শত্রুকে যতটা সম্ভব চাপে রাখা ছিল নবী(স.)-এর কৌশল। মদিনার পাশ দিয়ে, সিরিয়া থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বানিজ্য-পথ, ব্যবসায়ী জাতি কুরাইশদের ছিল জীবন-জীবিকা। সেই পথে তিনি অতর্কিত অভিযান চালিয়ে কুরাইশদেরকে অর্থনৈতিক অপমৃত্যুর সংকেত দিলেন। কিন্তু কোনোরকম লুটতরাজ বা রক্তপাত এর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু, অন্যত্র, প্রয়োজন অনুসারে তিনি প্রতিরক্ষামুলক যুদ্ধও করেছেন।

তাঁর সকল কৌশলগুলোর মূল ভিত্তি ছিল – সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, অসীম সাহস, আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা, পরম ধৈর্য এবং নিরবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের চর্চা। যখনি তিনি মানুষের সঙ্গে মিশতেন – জ্ঞানের চর্চা করতেন। আমরা যেই জ্ঞানের চর্চা, পড়া ছেড়ে দিয়েছি – আমাদের নেতৃত্বও চলে গেছে।

এবার নবী(স.)-এর রাষ্ট্র-নেতৃত্বের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। তাঁর রাষ্ট্র-পরিচালনার নীতি ছিল গণতান্ত্রিক, কিন্তু সেটা আজকের গণতন্ত্র ছিল না। গণতন্ত্র মানে মানুষের মতামত দানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা। কিন্তু যে বিষয়ে ব্যক্তি মতামত দিবেন, সেই বিষয়ে তার সঠিক জ্ঞান, বোধ থাকা বাধ্যতামূলক। অন্যথায়, সঠিক মতামত পাওয়া যাবে না। নেতৃত্ব ও শাসন ভুল /ক্ষতিকারক দিকে পরিচালিত হবে। তাই, নবী(স.)-এর গণতন্ত্রে কেবলমাত্র বিষয় সম্বন্ধে সঠিকভাবে অবগত ব্যক্তিদেরই মতামত নেওয়া হতো। এই ধারা কম-বেশি চার খলেফায়ে রাসেদিন পর্যন্ত চালু ছিল। তার পরে তো রাজতন্ত্রই পতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার দর্শন ছিল নেতৃত্ব বা দায়িত্ব কেবলমাত্র তাঁদেরই প্রাপ্য যারা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, সততা ও সত্যবাদীতায় শ্রেষ্ঠ হতেন। আজ হচ্ছে ঠিক তার উল্টো! সবচেয়ে বড়ো চোর, ধর্ষক, খুনি, প্রতারক, নাস্তিক, নির্মম, বেইমান, মিথ্যুকরা গায়ের জোরে নেতা হচ্ছে – জনগণের আগে আগে চলে - সমাজকে. দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। নবী(স.)-এর রাষ্ট্র-দর্শনে শাসক রাজা বা দেশের মালিক ছিলেন না – শাসক ছিলেন খলিফা (মানে, প্রতিনিধি)। দেশ, দেশের সম্পদ ও মানুষজনের প্রকৃত মালিক আল্লাহ - আর সেই মালিকের প্রতিনিধি কর্মচারি হিসাবে খলিফা শাসন-কার্য পরিচালনা করেন মাত্র। শাসক এখানে একজন বেতনভোগী কর্মচারি হিসাবে শুধু পরিসেবা দিয়ে যান; দেশের সম্পত্তি, জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুতে তাঁর কোনো অধিকার নেই, স্বীকারও করেন না। ফলে শাসক রাজার মতো অত্যাচারি না হয়ে চাকরের মতো অনুগত পরিসেবা দানকারি হন। তাই, খলিফার কাছে সাধারণে যে কোনো সময় যেতে পারেন, যে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারতেন – শাসক উত্তর দিতে বাধ্য থাকতেন। নবী(স.)-এর রাষ্ট্র-নেতৃত্বের দর্শন ছিল ধর্মনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থা। কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে (মুসলমান বা অমুসলমান) কেউ খুন করলে সে যেন সমস্ত মানবজাতিকেই খুন করল এবং নিরপরাধ কোনো ব্যক্তির জীবন বাঁচালে সমস্ত মানবতাকেই জীবন দান করলো। (পবিত্র কোরআন, সূরা: আল-মায়েদা, আয়াত:৩২)। তাঁর নেতৃত্বের আইন ছিল

মানবতাপূর্ণ, বাস্তবভিত্তিক। যেমন, একজন ব্যক্তি খুন হয়ে গেলে সবচেয়ে বেশি এবং প্রতক্ষ্য ক্ষতি হয় ব্যক্তির পরিবারের। তাই, খুনির বিচারে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের মতামতকে যেমন অগ্রাধিকার দিয়েছেন তেমনি সেই পরিবারের আর্থিক ক্ষতির দিকটি অনেকটা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন। অনিচ্ছাকৃত খুনের ক্ষেত্রে, খুন হওয়া ব্যক্তির পরিবারকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, তারা খুনিকে মাফ করবেন কী না? যদি মাফ করে দেন, তাহলে খুনি সেই পরিবারকে 'রক্ত-মূল্য' হিসাবে একশতটি উট বা তার বাজার-মূল্যের অর্থ দিতে বাধ্য থাকবে। বর্তমান বাজার-মূল্যে সে পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা। এই অর্থে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের অনেকটা সাহায্য হয়। আমাদের দেশে খুনির বিচারে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সমস্যার কোনো সুরাহা হয় না। খুনিকে মাফ কারা বা না করার বিসয়েও ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে ন্যায় বা প্রাপ্য সম্মানও দেওয়া হয় না! খুনিকে মাফ করার অধিকার রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে – যদিও সেই খুনে রাষ্ট্রপতির কোনো লাভ-লোকসান হয়নি।

শুধুমাত্র ভৌগলিক অবস্থান বা গোষ্ঠীনির্ভর সংকীর্ণ জাতিয়তাবাদ তাঁর রাষ্ট্রনীতি ছিল না। তিনি শুধুমাত্র মানব-উৎকর্ষতা নির্ভর সামগ্রিক মানবতাভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদে বশ্বাসী ছিলেন। বিদায় হজ্জের বক্তৃতায় তিনি নিজে একজন আরব হয়েও নিজের আরব জাতিকে শ্রেষ্ঠ বলছেন না! পক্ষান্তরে তিনি বলছেন - কোনো আরব অনারবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো অনারবও আরবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়; কোনো কালো কোনো ফর্সার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, কোনো ফর্সাও কালোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়; ধনী গরিবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়, গরিব ধনী চেয়ে নয় – শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র ন্যায়পরায়নতা ও ভালো গুণের জন্য। - বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, বিশ্ব-শান্তি ও উৎকর্ষ গুণের উৎসাহের জন্য এরূপ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি অপরিহার্য। বর্তমানে ছোটো ছোটো ভৌগলিক সীমারেখায় আবদ্ধ প্রতিটি দেশের নেতারা নিজেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রচার করতেই সকল শক্তি লাগিয়ে দেন! অন্য কারও শ্রেষ্ঠত্ব বরদাস্ত করা সম্বব নয়! গায়ে জোর থাকলে ততক্ষণাৎ অন্যের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে বন্য হিংস্র পশুর মতো তীক্ষ্ণ দন্ত-নখর নিয়ে ঝাপিয়ে পরে! মানবসভ্যতার অবস্থা আজ - পৃথিবী নামক জঙ্গলের জায়গায় জায়গায় জাতিয়তাবাদের ইউনিফর্ম পরা হিংস্র মাংসাসী পশুরা লোভ, লালসা, হিংস্রতার থাবা উত্তলন করে আর এক হিংস্র জাতিয়তাবাদীকে শিকার করতে উদগ্রীব! মানবতা, দুর্বলের সুরক্ষা, ন্যায়-অন্যায়বোধ – এসব এখাকে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়!

শেষে নবী(স.)-এর উক্ত রাষ্ট্র-নেতৃত্ব থেকে মানব সভ্যতা কতটা লাভবান হয়েছে? – তা দেখা। ১৯৭৮ সালে আমেরিকার মহাকাশ-পদার্থবিদ্যার বিখ্যাত অধ্যাপক মাইকেল এইচ হার্ট *"The 100: Ranking of the Most Influential Persons in History"*, নামে যে বইটি লিখেছেন, তাতে তিনি নবী মুহাম্মদ (স.)-কে পৃথীবির ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। তার মতে, নবী(স.)-ই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতা – উভয় দিক দিয়েই চরম সফলভাবে পৃথিবীর ইতিহাসে অবদান রেখে গেছেন। - এইখানেই তাঁর রাষ্ট্র-নেতৃত্বের সফলতা। তিনি শুধু একটা বর্বর বেদুইন আরব জাতিকেই আতি অল্প সময়ে সুসভ্য করে তোলেন নি, সমগ্র

মানব-সভ্যতায় শান্তি, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার, জাত-পাত-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ কাজ তিনি ইতিহাসের এমন সময় করেছেন যখন সারা পৃথিবী অন্ধকার, বর্বরতায় ডুবে ছিল। মহিলাদের তিনি সেই সময় সমানাধিকার দিয়েছেন যখন তাদেরকে শুধু উপভোগ্য পণ্যসামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হতো না! গরিব, দাসকে তিনিই সম্মানিত করেছেন – হাবসী কালো দাস হজরত বিলাল (রা.) কে তিনিই মক্কা জয়ের পরে কাবা শরিফের উপরে উঠে আজান দেওয়ার বিরল সম্মানে বিভুষিত করেছেন। সেই শিক্ষারই ধারা বেয়ে দিল্লীর কুতুব মিনার আজও ঘোষণা দিচ্ছে যে নবী(স.)-এর রাষ্ট্র-নেতৃত্বের দর্শনের জন্যই দাস কুতুবুদ্দিন ও দাসী রিজিয়া সুলতানা রাষ্ট্র-প্রাধান, শাসক হতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ ন্যায়-বিচার অদ্বিতীয়।

নবী(স.)-এর রাষ্ট্র-নেতৃত্ব থেকে আমাদের শিক্ষনীয় ও অনুসরণীয় বিষয় হল – নির্যাতিত সমাজের মানুষদের মুক্তির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অপরিহার্য। তার জন্য নিজেদের মধ্যে মদিনা সনদের অনুরূপ একতা দরকার। নিজেদর লক্ষ্যে দৃঢ় আবস্থান নেওয়া ও ধৈর্য সহকারে কাজে অবিচল থাকা। কেবলমাত্র জ্ঞানী, বিচক্ষণ, আত্মত্যাগী যোগ্য ব্যক্তিকেই নেতা হিসাবে অনুসরণ করা। তার পরে সামাজিক দাসত্ব, মানুষের দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্ত করা। ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে মানবতার দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করাকেই জীবনের ব্রত হিসাবে নেওযা। নবী(স.) দ্বারা পরিচালিত বদরের যুদ্ব থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। পবিত্র কোরআনের সূরা আন-নিশার ৭৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহতাওয়ালা আমাদেরকে এই কাজের হুকুম করেছেন – কী কারণ থাকতে পারে যে নির্যাতিত মানুষের উদ্ধারে তোমরা লড়াই করবে না; যারা দুর্বল হওয়ার কারণে অত্যাচারিত হচ্ছে এবং আল্লাহর কাছে ফরয়াদ করছে যে, হে আল্লাহ আপনার কাছ থেকে কোনো বন্ধু, দরদী বা সাহায্যকারী পাঠিয়ে দায়। - নবী(স.) কে ভালোবাসলে আমাদেরকে সেই হুকাম অবশ্যই পালন করতে হবে। সেই জন্য নিজেদের নেতৃত্ব অবশ্যই তৈরি করতে হবে।